ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর
প্রাথমিক পাঠ

FairFinance Bangladesh | OXFAM | FAIR FINANCE ASIA

ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর
প্রাথমিক পাঠ

প্রথম পর্ব

ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর : প্রাথমিক পাঠ

প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
ফেয়ার ফাইন্যান্স বাংলাদেশ

রচনা
এম রহমান
রাজু আহমেদ
নুরুল আলম মাসুদ

অর্থায়ন
ফেয়ার ফাইন্যান্স এশিয়া

নকশা
রেডলাইন

স্বত্ব
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান

সূচিপত্র

ভূমিকার বদলে ০৪
রূপান্তর ০৯
ন্যায্য রূপান্তর কী ০৯
নেট-জিরো ট্রানজিশনের মানবিক প্রভাব ১১
এই ধারণা কোথা থেকে আসলো? ১২
ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা ১৪
ন্যায্য রূপান্তরের সাথে সভ্যতা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক কী ১৮
সভ্যতা ও ন্যায্য রূপান্তর ১৯
পরিবেশ ও ন্যায্য রূপান্তর ২০
জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর ২১
শ্রম অধিকার ও ন্যায্য রূপান্তর ২২
ন্যায্য রূপান্তরে শ্রম অধিকারের মূল দিক ২২
শ্রম অধিকার এবং ন্যায্য রূপান্তরের আন্তঃসম্পর্ক ২৪
ন্যায্য রূপান্তরে পরিবর্তনের শ্রম অধিকার রক্ষায় চ্যালেঞ্জ ২৪
জেন্ডার ও ন্যায্য রূপান্তর ২৫
আন্তর্জাতিক নীতিমালায় ন্যায্য রূপান্তর ২৬
ন্যায্য রূপান্তরের ন্যায্যতা রক্ষার উপাদান কী কী ৩০
ন্যায্য রূপান্তরের উপাদান কী কী ৩১
ন্যায্য রূপান্তরের খাতসমূহ ৩৭
ন্যায্য রূপান্তরের মানদন্ড ৩৮
ন্যায্য রূপান্তর মানদন্ডের মূলনীতি ৪০
ন্যায্য রূপান্তর মানদন্ডের চ্যালেঞ্জ ৪১
বাংলাদেশে ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা ৪১
জ্বালানি রূপান্তর কী ৪৩
জ্বালানি রূপান্তরের উপাদান ৪৩
জ্বালানি রূপান্তরের চালিকাশক্তি ৪৪
শক্তি রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ ৪৫
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি রূপান্তর ৪৬
জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য এবং নীতি ৪৭
বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ ৪৯
বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তরের সম্ভাবনা ৪৯
ন্যায্য রূপান্তরে সুশীল সমাজের ভূমিকা ৫০

ভূমিকার বদলে

বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য কখনও 'অভিযোজনের রাজধানী', কখনও অভিযোজনের গুরু বা কখনও অভিযোজনে নেতা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তবে অভিযোজনের এই আত্মতৃপ্তি দিয়ে মিটিগেশন একশন বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে হেলাফেলা করার কোন সুযোগ নেই। বরং যত দ্রুত এবং যতটা সম্ভব গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২.১ শতাংশ। অন্যদিকে বৈশ্বিক গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনে বাংলাদেশের অবদান মাত্র .৫ শতাংশ। তবুও ২০২১ সালে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (UNFCCC) জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান প্রতিবেদনে বাহিরের কোন সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন ৬.৭৩ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাহ্যিক সহযোগিতা পাওয়া গেলে এই লক্ষ্য ২১.৮৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এই পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জিএইচজি (GHG) নির্গমন হ্রাসের ৯৬.১ শতাংশই জ্বালানি খাতে হবে, যেখানে বিদ্যুৎ (৪৮.১%), ইটভাটা (১২.৪৭%) এবং পরিবহন (১০.৮৬%) বড় উপখাত হিসেবে চিহ্নিত। এই উপখাতগুলোর নির্গমন কমাতে কোনো পদক্ষেপ নিলে, এই সব সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

ন্যায্য রূপান্তরের (Just Transition) ধারণা আসলে এখান থেকেই উৎসারিত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সংজ্ঞা অনুযায়ী ন্যায্য রূপান্তর বলতে অর্থনীতিকে এমনভাবে সবুজায়ন করা বুঝায় যার

মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটি হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কাউকে পিছনে ফেলে নয়।

১৯৯৩ সালকে কখনও কখনও ন্যায্য রূপান্তরের বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিবেশ কর্মী টনি ম্যাজকি ঐ সময়ে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির কারনে স্থানচ্যুত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য একটি 'সুপারফান্ড' তৈরির কথা বলেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ধারাবাহিক চাপ থাকা সত্ত্বেও, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সংলাপে ন্যায্য রূপান্তর ধারণা মূলধারায় আসতে বেশ সময় লেগে গেছে। অবশেষে ২০১০ সালে ক্যানকুণে অনুষ্ঠিত কণফারেন্স অব পার্টিজ (COP 16)-এর চূড়ান্ত চুক্তিতে ন্যায্য রূপান্তরের ধারণা স্থান পায়।

২০১৫ সালে তিনটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ঘটে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ন্যায্য রূপান্তর বাস্তবায়নের জন্য এতটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) কয়েকটি লক্ষ্যে ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়টি যুক্ত করা হয়। অন্যদিকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির প্রস্তাবনায় ন্যায্য রূপান্তরের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তী COP সম্মেলনগুলোতেও ন্যায্য রূপান্তরের ধারণা আরো

এসডিজি-তে ন্যায্য রূপান্তরের অন্তর্ভুক্তি

এসডিজি (SDG) ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি;
এসডিজি (SDG) ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
এসডিজি (SDG) ১২: পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন;
এসডিজি (SDG) ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম।

স্বীকৃতি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত COP 26- গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। এই চুক্তিতে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে কম-কার্বন নির্গমন ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

২০২২ সালে মিশরের শারম আল-শেখে অনুষ্ঠিত COP 27-এ গৃহীত 'শারম আল-শেখ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা'-তে একটি বিশেষ অধ্যায় 'VIII-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ন্যায্য রূপান্তরের বাস্তবায়নের একটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এতে জোর দেওয়া হয়েছে যে:'... জলবায়ু সংকটের জন্য টেকসই ও ন্যায্য সমাধানগুলো অবশ্যই অর্থবহ এবং কার্যকর সংলাপ প্রক্রিয়া ও সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হতে হবে" এবং '... ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক রূপান্তর এমন বিষয় যা জ্বালানি, আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি, শ্রমশক্তি এবং অন্যান্য দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং যেগুলো অবশ্যই জাতীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে'।

জাতীয় অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে বলতে গেলে, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১) এর ৭৬.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের খসড়া পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের প্রথম বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যদিও এটি এখনও পর্যন্ত খসড়া হিসেবে আছে। এই পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে 'শ্রমের ন্যায্য রূপান্তর এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে শিল্পকে ভবিষ্যতের টেকসই শিল্প হিসেবে প্রস্তুত করা'-র কথা বলে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায় ১১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন, যা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা-এর একটি প্রধান দিক হলো ৪.১ মিলিয়ন নতুন জলবায়ু-সহনশীল কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩.৯ শতাংশে কমিয়ে আনা।

MCPP ন্যায্য রূপান্তর এবং আধুনিকায়নকে অটোমেশন প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির উদ্ভাবনী দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতার সম্প্রসারণ, সহনশীল অবকাঠামোর উন্নয়ন, এবং রেজিলিয়েন্স বন্ড চালু করার পরিকল্পনা করেছে। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩.৮৩ মিলিয়ন মানুষকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃদক্ষতা প্রদান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনঃদক্ষতা ও জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ শ্রম বাজার উদ্যোগের মাধ্যমে, এই পরিকল্পনা কম উৎপাদনশীল ও নিম্নবেতন ভিত্তিক উন্নয়ন কাঠামোকে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির কাঠামোতে রূপান্তরের করার পরিকল্পনা কথা উল্লেখ করে।

মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা-বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (NSDC), ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (NSDA) এবং ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (NHRDF)-কে ন্যায্য রূপান্তর (Just Transition) সমন্বয়, সহায়তা ও সহজতর করার জন্য ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০২২ সালে, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ICCCAD) এবং ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশ (ULAB) পৃথকভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য রূপান্তর বোঝার লক্ষ্যে বেশ কিছু গবেষণা পরিচালনা করে। এই

গবেষণাগুলো নির্বাচিত কয়েকটি সেক্টরে (যেমন তৈরি পোশাক, জ্বালানি এবং কৃষি) ন্যায্য রূপান্তর বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী বেশ কিছু পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশ অটোমেশন, দক্ষতা উন্নয়ন, সার্টিফিকেশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ন্যায্য রূপান্তরের (Just Transition) কার্যকর সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণ এখনো একটি বড় প্রশ্ন। জলবায়ু সংকটের মধ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্য ধরে রাখা এবং একই সঙ্গে প্রভাবিত শ্রমিকদের কথা শোনা ও তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান নিশ্চিত করে ন্যায্য রূপান্তর অর্জন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

রূপান্তর

Climate Action + Social Inclusion = the Just Transition

ন্যায্য রূপান্তর কী?

ন্যায্য রূপান্তর বলতে এমন পরিবর্তনকে বুঝায় যা সবার ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। প্রথমদিকে এ ধারণা স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যু হলেও পরবর্তীতে এটি বৃহত্তর পরিমন্ডলে বৈশ্বিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এ আলোচনা জলবায়ু পরিবর্তন, বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব বিভাজন এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মাঝে ভোগ, দূষণ ও অভিযোজনের সক্ষমতার আলোচনায় বিস্তৃত হয়। স্বল্প-কার্বন অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প থেকে সরে আসা সম্ভব অন্যদিকে একটি কার্যকরি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ন্যায্য রূপান্তর ধারণা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ন্যায় বিচারের উদ্বেগ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। তবে এটিকে বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায় বিচারের সমস্যা এবং বৈশ্বিক বৈষম্যের বাস্তবতা থেকে আলাদা করা যায় না। স্বল্প কার্বন অর্থনীতিতে বৈশ্বিক রূপান্তর জীবাশ্ম জ্বালানি এবং দূষন কেন্দ্রিক উৎপাদনশীলতা কমিয়ে কৌশল গ্রহণ করার মাধ্যমে সুযোগ তৈরি হতে পারে। ফলে কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। স্বল্প-কার্বন এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনীতি ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে বা পিছিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য রূপান্তরকে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ন্যায্য রূপান্তর-এর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ নিশ্চিত করতে হবে, যা ঝুঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার চাহিদা, অগ্রাধিকার, বাস্তবতা,

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অবক্ষয় প্রতিরোধে দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটাবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ন্যায় বিচারের উদ্বেগের কারণে ন্যায্য রূপান্তরের ধারণাটিকে বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায় বিচারের ইস্যুও সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী ন্যায্য রূপান্তরের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরও বেশি পিছনে ঠেলে না দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো উৎপাদনশীল ক্ষমতা, নতুন মেধা কাঠামো, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাগুলোর অর্থ প্রদানের জন্য কাঠামোর সম্প্রসারন এবং পরিকাঠামোর জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিগত পদক্ষেপ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহায়তার ন্যায্য রূপান্তর টেকসই রূপ ধারণ করবে।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক ক্লিন এনার্জি সম্প্রসারণের দশক হিসেবে বিবেচিত হয়। একই সাথে প্রতিটি সেক্টর জুড়ে ব্যাপক হারে কার্বনের ব্যবহার এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা হয়। আইপিসিসি (International Panel on Climate Change) এর সর্বশেষ মূল্যায়ন থেকে বুঝা যায় যে, নির্গমন কমানোর প্রযুক্তির ঘাটতি নাই। তবে জলবায়ু কার্যক্রমের গতি এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর মানদন্ড অপর্যাপ্ত। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি-এর নির্ধারিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ২০৫০ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হলেও ব্যবহার আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু যদি রূপান্তর এর প্রক্রিয়া সঠিক না হয় তাহলে ডিকার্বনাইজেশনের গতি এবং স্কেল মানুষের বিশাল একটি অংশের বড় ধরনের সামাজিক ঝুঁকি নিয়ে আছে।

ন্যায্য রূপান্তরের ধারণা ডিকার্বনাইজেশনের সামাজিক প্রভাবগুলোর অপরিহার্যতার প্রতিফলন ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায়,

ডিকার্বনাইজেশন একটি প্রক্রিয়া যা টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শোভন কাজ এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির সময় মানবাধিকার রক্ষায় বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আবার অনেকে বলেন, অর্থনীতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তরের সময় বৈষম্য এবং অন্তর্ভুক্তি শনাক্ত করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবেলা একটি প্রজন্মের জন্য সুযোগ।

নেট-জিরো ট্রানজিশনের মানবিক প্রভাব

অধিকাংশ দেশে অপরিকল্পিতভাবে রূপান্তরের ফলে বেশ কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন- কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে যাওয়া, সবুজ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি। রূপান্তর সঠিকভাবে না হলে বৃহৎ জনগোষ্ঠী সামাজিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেমন-

শ্রমিক: আইএলও-এর হিসাব মতে, জলবায়ু-নিরপেক্ষ ও সারকুলার অর্থনীতি চালু হলে প্রায় ৮০ মিলিয়ন শ্রমিক চাকুরি হারাবে। একই সঙ্গে ১০০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও হবে। যার বহিঃপ্রকাশ নিম্নোক্তভাবে হতে পারে-

আদিবাসী জনগণের উপর যে প্রভাব পড়বে, তার সমাধান প্রক্রিয়ার তাদের অংশগ্রহণ নাও থাকতে পারে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূমি আদিবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বিশ্বের অবশিষ্ট জীববৈচিত্র্যের প্রায় ৮০% রয়েছে। পৃথিবীতে প্রতি ৩ জনের একজন তাদের সুস্থতা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য আদিবাসীদের জমির উপর নির্ভরশীল। আদিবাসীদের আওতায় থাকা জমিগুলো বেশ টেকসইভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা পুরো বাস্তুসংস্থানে বিশেষ অবদান রাখে, কিন্তু জাতীয়ভাবে এই অবদানের মূল্যায়ন করা হয় না, সংখ্যায় বললে যা প্রায় ১০%। আদিবাসীরা বর্তমানে জলবায়ু তহবিলের মাত্র ১% পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে, তাদের যৌথ জমিতে সঞ্চিত কমপক্ষে ২৯০ জিটি কার্বন ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে, যা ২০২১ সালের জন্য মোট বিশ্বব্যাপী নির্গমনের ৫ গুনের সমান।

ভূমি এবং পরিবেশ রক্ষাকারী: পরিবেশ রক্ষাকারী হওয়া সত্ত্বেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঝুঁকির সম্মুখীন হন। কারণ কখনও কখনও পরিবেশ ঝুঁকি নিরসণ করতে তাদের দৃঢ় অবস্থান তাদের নতুন ঝুঁকিতে ফেলে আবার অন্যদিকে অপরিকল্পিত পরিবর্তন বা দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়িক কাজের প্রতিবাদ করে তারা বিপদে পড়েন। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে ভূমি ও পরিবেশ রক্ষার ঘটনায় হত্যা ঘটনা ১৭৭টি, ৪১৫টিরও বেশি হিংসাত্মক আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটেছে এবং একটি নীরব কৌশল হিসেবে পরিবেশরক্ষাকারীদের অপরাধীকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ধারণা কোথা থেকে আসলো?

ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি ১৯৭০ এর দশকে উত্তর আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন থেকে উদ্ভূত হয়। শুরুর দিকে ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি পরিবেশ রক্ষার নীতিগুলোর কারণে যেসব শিল্পে পরিবর্তন ঘটেছিল সেইসব শিল্পের শ্রমিকের অধিকার এবং স্থানীয় কমিউনিটির

কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি মূলত মার্কিন শ্রম ও পরিবেশবাদী কর্মী টনি মাজোকি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের ন্যূনতম মজুরী এবং স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে ভালো চাকুরী প্রদান করেন ও শ্রমিকের জন্য সুপার ফান্ড ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন। তবে পরিবেশবাদীরা মনে করেন "সুপার ফান্ড" শব্দটি ভুল ধারণা দিয়েছে এবং এর থেকে "ন্যায্য রূপান্তরের" উদ্ভব হয়েছে।

ড. এ. পিনকার (২০২০) বলেন, ন্যায্য রূপান্তর ধারনাটি ১৯৭০ এর দশকে উত্তর আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে উদ্ভূত হয়। শ্রমভিত্তিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, ন্যায্য রূপান্তর চলমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক এবং কমিউনিটির সদস্যদের অধিকারের বিষয়ে আলোকপাত করে। একসময় মনে করা হতো যে, পরিবেশ সুরক্ষা নীতির কারণে চাকুরী হারানো শ্রমিকদের সহায়তার একটি কর্মসূচি হিসেবে মনে করা হতো।

জলবায়ু পরিবর্তনের আগ্রহ এবং এর প্রভাবগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইউনিয়নগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যক্রমের সাথে কেবল রূপান্তরকে যুক্ত করতে শুরু করে। যেমন ন্যায্য রূপান্তর প্রত্যয়টি শ্রমভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত কারণ এটি পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে টেকসই চাকুরি, খাত এবং অর্থনীতিতে রূপান্তরকে বিবেচনা করা হয়।

ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার শাসন ব্যবস্থায় "ন্যায্য রূপান্তর" হওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রচারণা চালায়। যদিও তারা সঠিক শব্দটি ব্যবহার করেনি তবুও ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে সম্মত হয়েছিল যা সম্মিলিতভাবে "ন্যায্য রূপান্তরের" প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন সবার জন্য ভালো চাকুরী (অভীষ্ট ৮), সবার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি (অভীষ্ট ৭), জলবায়ু

সুরক্ষা (অভীষ্ট ১৩) এবং দরিদ্র দূরীকরণ (অভীষ্ট ১)। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের প্যারিস চুক্তি জলবায়ু মোকাবেলার জন্য একটি সমন্বিত পদক্ষেপ যা ন্যায্য রূপান্তরকে বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে দেশগুলো কার্যক্রম বাড়াতে সম্মত হয়। জাতীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত উন্নয়ন অগ্রাধিকার এ ন্যায্য রূপান্তরের কথা বলা আছে।

কর্মশক্তির ন্যায্য রূপান্তর এবং শোভন কাজ ও মান সম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কোপ ২৬ সম্মেলনে ১৫টি দেশ আন্তর্জাতিক ন্যায্য রূপান্তর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে এবং ঘোষণাপত্র মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পোল্যান্ড, স্পেন, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইতালি এবং বেলজিয়াম।

ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অবনয়নের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আরও কম কার্বন অর্থনীতির দিকে সরে যাওয়ায় ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। পরিবর্তনশীলতা অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে যাতে করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যাতে করে মূলধারায় আসে। ন্যায্য রূপান্তরের প্রাসঙ্গিকতা অথবা প্রয়োজনীয়তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হলো-

১. অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা

সবুজ অর্থনীতির রূপান্তরের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন-কয়লা,

খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের মতো জ্বালানি খাতে যারা কাজ করে তারা চাকুরি হারাতে পারে। এই সেক্টরে যারা কাজ করে তারা পর্যাপ্ত সমর্থন ছাড়া বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হতে পারে। তাই জ্বালানি খাতে স্থিতিশীলতার জন্য ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে।

আইএলও এর মতে, ন্যায্য রূপান্তর মেকানিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে যারা চাকুরি করে তাদেরকে পুনরায় প্রশিক্ষিত করে এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই শিল্পে রূপান্তর হতে পারে।

২. অর্থনৈতিক সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রচার

ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (২০২০) অনুযায়ী, জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল কমিউনিটিগুলো প্রায়শই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সম্পদের উপর, শিক্ষার উপর এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। বিশ্ব অর্থনীতি নিরাপদ জ্বালানির দিকে অগ্রসর হওয়ায় কমিউনিটিগুলো অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ন্যায্য রূপান্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয় এবং প্রান্তীক জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে, টেকসই জীবিকার জন্য এবং সবুজ খাতে বিনিয়োগের জন্য কাজ করে। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায় যা অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক এবং কমিউনিটির চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়।

৩. সামাজিক অস্থিরতা ও অসমতা প্রতিরোধ করা

সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের সময়

রেফারেন্স: ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও), জাস্ট ট্রানজিশন: এ ফেয়ার অ্যান্ড ইনক্লুসিভ প্রসেস ফর এ গ্রিন ইকোনমি (২০১৫)।

অস্থিরতা এবং অসমতা সৃষ্টি হয়। অস্থিরতা এবং অসমতা প্রতিরোধ করার জন্য ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক (২০১৭) এর মতে, ন্যায্য রূপান্তরের অনুপস্থিতি সামাজিক অস্থিরতা এবং অনেক বেশি বৈষম্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের কর্মীদের জন্য বিকল্প সুযোগ তৈরি করে দেয়া না হয় তাহলে অসন্তোসজনক অবস্থার তৈরি হতে পারে। ফলে সামাজিক সংহতি ব্যহত হতে পারে, ধনী এবং দরিদ্রদের ব্যবধান বৃদ্ধি হতে পারে এবং বৈষম্য বেড়ে যেতে পারে। ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করে যে সকল মানুষ বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে নাজুক, সবুজ অর্থনীতির অংশ, সামাজিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের ঝুঁকি হ্রাস করে।

৪. দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সহজতর করা

গ্লোবাল কমিশন অন দ্যা ইকোনমি অ্যান্ড ক্লাইমেট (২০১৪) অনুযায়ী, সবুজ অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া শুধুমাত্র পরিবেশগত অপরিহার্যতা নয় বরং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন। জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা অর্থনীতিকে অস্থির জ্বালানি শক্তির দাম এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি করে। ন্যায্য রূপান্তরের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং টেকসই অনুশীলন অর্থনীতিকে স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করে। ন্যায্য রূপান্তর নীতিগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে শিল্পের বৈচিত্রতা আনতে সহায়তা করে যাতে করে সবুজ অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি লাভ হয়।

৫. জলবায়ু এবং টেকসই লক্ষ্য পূরণ

প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তি, দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং টেকসই ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। ন্যায্য রূপান্তর না হলে পরিবর্তনের ফলে বৈষম্য এবং দারিদ্র্যতা বাড়তে পারে। এছাড়া জলবায়ু নীতি সমর্থন হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ন্যায্য রূপান্তরের ফলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন

নিম্ন আয়ের মানুষের এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর অসামঞ্জস্যভাবে চাপ সৃষ্টি করে যা বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনকে আরও বেশি অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং কার্যকর করে তোলে।

৬. বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম অনুযায়ী, জলবায়ু সংকটে বৈশ্বিক প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য সহযোগিতামূলক পদ্ধতিগত কার্যক্রমের প্রয়োজন। দেশ ভেদে রূপান্তরের সক্ষমতার পরিবর্তন হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য অর্থের যোগান, প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোর অভাব হয়। ন্যায্য রূপান্তরের জন্য বিশ্বব্যাপী সংহতির প্রয়োজন যাতে করে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করবে। ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করে যে ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে। রূপান্তর যদি ন্যায্য না হয় তাহলে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৭. জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য জনসমর্থন তৈরি করা

সবুজ পরিবর্তনের সাফল্য জনসর্থনের উপর নির্ভর করে। সাধারণ মানুষ যদি মনে করে তারা পিছিয়ে থাকবে অথবা রূপান্তর অর্থনৈতিক অবনয়নের দিকে নিয়ে যাবে তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। ন্যায্য রূপান্তর সবুজ অর্থনীতির সুবিধাগুলো প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বাস ও ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য কাজ করে। এছাড়া রূপান্তরের সেপ বা আকৃতি দেয়ার জন্য কর্মীদের সম্পৃক্ততা এবং কার্যকারিতা বাড়াতে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয় কারন তারা

রেফারেন্স: ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি), জাস্ট ট্রানজিশন এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (২০১৮)।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের টেকসই অনুশীলন বাস্তবায়নের মূল অংশীজন।

টেকসই, স্বল্প-কার্বন অর্থনীতিতে স্থানান্তর যে সকলের জন্য ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অর্থনৈতিকভাবে উপকারী তা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণ। এটি নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব রোধ করে, বৈষম্য কমায় এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন সহজতর করতে সহায়তা করে। সবুজ রূপান্তরকে ন্যায্যসঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে।

ন্যায্য রূপান্তরের সাথে সভ্যতা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক কী?

সভ্যতা, পরিবেশ ও ন্যায্য রূপান্তরের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। উন্নয়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কৃষির মাধ্যমে সভ্যতা গড়ে উঠে। আবার অনেক সময় সভ্যতা গড়ে উঠার সময় পরিবেশের অবনয়ন যেমন-বন উজাড়, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটে। পরিবেশ সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া সম্পদ, বাসযোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকেও পরিবেশ প্রভাবিত করে। ন্যায্য রূপান্তর

চিত্র ১: ন্যায্য রূপান্তর

একদিকে যেমন পরিবেশগত স্থায়িত্বের বিষয়টি আমলে নেয় অন্যদিকে মানব জাতির অগ্রগতির বিষয়টিও প্রাধান্য দেয়। এটি পরিবেশগত সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায্যতার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখে যাতে করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পরিবেশগত নীতির সুফল পায়।

সভ্যতা, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। সভ্যতা- নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও সম্পদ আহরণের মাধ্যমে পরিবেশকে পরিবর্তন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। জলবায়ু পরিবর্তন সভ্যতার জন্য অস্তিত্বগত ঝুঁকি তৈরি করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হয়। ন্যায্য রূপান্তর টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। ন্যায্য রূপান্তর পরিবেশগত স্থিতিশীলতার সাথে মানুষের চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শিল্প, জ্বালানি ব্যবস্থা এবং নীতির পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে।

সভ্যতা ও ন্যায্য রূপান্তর

সভ্যতা এবং ন্যায্য পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক সমতা এবং টেকসইয়ের সাথে সামাজিক অগ্রগতির ভারসাম্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সভ্যতা ঐতিহাসিকভাবে পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে যা প্রায় অসমতা এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত হয়। ন্যায্য পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ন্যায় সঙ্গত নীতিগুলো প্রচার করে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে টেকসই অনুশীলনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের সময় কেউ যাতে পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করা। সভ্যতা এবং ন্যায্য রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্কটি পরিবেশগত। সামাজিক ন্যায্যতার সাথে সামাজিক অগ্রগতি একীভূত করার প্রয়োজন আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ

ব্যবহার না করে শিল্প ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে সভ্যতা গড়ে ওঠে যাতে করে পরিবেশগত অবক্ষয় এবং সামাজিক বৈষম্য রোধে ভূমিকা রাখতে পারে। ন্যায্য রূপান্তর টেকসই এবং ডিকার্বনাইজেশন এর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে অর্ন্তভুক্ত করতে কাজ করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্যই ন্যায্য রূপান্তর ধারণার জন্ম।

পরিবেশ ও ন্যায্য রূপান্তর

ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি পরিবেশগত টেকসইয়ের সাথে গভীরভাবে জড়িত এবং পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে টেকসই অর্থনীতির ন্যায় সঙ্গত পরিবর্তনের জন্য ন্যায্য রূপান্তরের কাঠামো কাজ করে। এই ধারণাটি সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তর নিশ্চিত করে এবং রূপান্তরের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী, কমিউনিটির সদস্য এবং প্রান্তীক জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাবেব বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্দেশনা প্রদান করে। ন্যায্য রূপান্তর এবং পরিবেশের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

সামাজিক সমতা এবং জলবায়ু কার্যক্রম: জলবায়ু কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় সামাজিক সমতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্বল্প-কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তরের সময় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কেউ যাতে সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করে।

পরিবেশগত সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে টেকসই অর্থনীতি এবং টেকসই কৃষির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলো থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্পে রূপান্তরের সময় প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো সবুজ কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে শ্রমিক ও কর্মীরা রূপান্তরিত শিল্পে কাজ না হারায়।

কমিউনিটির উত্তরণ: ন্যায্য রূপান্তরের প্রবক্তারা এমন নীতিগুলোর উপর জোর দেয় যা স্থানীয় কমিউনিটিকে পরিবেশগত নীতি পরিবর্তনের কারণে যে প্রভাব পড়ে এই প্রভাবগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য সামর্থবান হন। যেমন-কার্বন নিঃসরণের মূল্য নির্ধারণ বা শিল্পকারখানার বিলোপ সাধন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর

ন্যায্য রূপান্তর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত কারণ এর মূল লক্ষ্য হলো স্বল্প-কার্বন অর্থনীতিতে ন্যায় সঙ্গত রূপান্তর এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তভুক্তিতা। টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এবং পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ন্যায্য রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্কের মূল দিকগুলো হলো-

জলবায়ু কার্যক্রমে সমতা: জলবায়ু পরিবর্তন নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিকার্বনাইজেশনের প্রয়োজন পড়ে। ফলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব কর্মী কাজ করে তাদের চাকুরি হারানোর আশংকা থাকে। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠান এবং জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করে। অন্যদিকে পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের বিষয়টি আমলে নেয়।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: ন্যায্য রূপান্তর কাঠামোতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। পিছিয়েপড়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য ন্যায্য রূপান্তর কাঠামো নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে প্রভাবিত করে।

বৈশ্বিক প্রভাব: ন্যায্য রূপান্তর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, অসমতা এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে প্রবেশাধিকারের বিষয়গুলো সমাধান করে। এটি জলবায়ু কার্যক্রমের সুবিধা যেমন-সবুজ কর্মসংস্থান এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

জলবায়ু চুক্তির সাথে সমন্বয়: আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি যেমন প্যারিস চুক্তির (২০১৫) গুরুত্ব ন্যায্য রূপান্তরে তুলে ধরা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালার সাথে সমন্বয় করে ন্যায্য রূপান্তর কাজ করে যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়।

শ্রম অধিকার ও ন্যায্য রূপান্তর

টেকসই এবং স্বল্প-কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তর যাতে ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম অধিকার এবং ন্যায্য রূপান্তরের সমন্বয় প্রয়োজন। ন্যায্য রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে শ্রম অধিকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, মর্যাদাপূর্ণ কাজ নিশ্চিত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেয়। কারণ শিল্প ও অর্থনীতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যতম ক্ষেত্র।

ন্যায্য রূপান্তরে শ্রম অধিকারের মূল দিক

- **কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা**: জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন-কয়লা, জ্বালানি তেল এবং গ্যাস) খাতে যেসব কর্মী কাজ করে তারা রূপান্তরের সময় চাকুরি হারাতে পারেন। ন্যায্য রূপান্তর সবুজ সেক্টরে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে।
- **মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা**: আইএলও সবুজ

অর্থনীতি খাতে রূপান্তরের সময় ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা যেমন পেনশন ও স্বাস্থ্যসেবার মতো বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়।

- **দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনঃপ্রশিক্ষণ:** ন্যায্য রূপান্তর ফ্রেমওয়ার্ক উদীয়মান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষতা বিনির্মাণের জন্য পুনরায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি সুপারিশ করে।
- **সামাজিক সংলাপ:** সামাজিক সংলাপ আইএলও-এর কাজের অন্যতম একটি পিলার। আইএলও তাই ন্যায্য রূপান্তরের আলোচনায় শ্রমিক ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করার বিষয়টি জোর দেয়। নতুন নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন শ্রমিক ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নকে সংলাপ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- **সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি:** ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন শ্রমিক,

অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও নারী শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ক্ষতির শিকার না হয় সেজন্য আইএলও যথাযথ নীতিপরিকল্পনার সুপারিশ করে। আর এই নীতি-পরিকল্পনায় অবশ্যই এই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও দাবির বিষয়টি প্রাধান্য প্রদান করা হয়।

শ্রম অধিকার এবং ন্যায্য রূপান্তরের আন্তঃসম্পর্ক

- আইএলও ২০১৫ সালে ন্যায্য রূপান্তরের সময় শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি নীতিমালা সুপারিশ করে। নীতিগুলো হলো:
  - পূর্ণকালীন স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতা;
  - শ্রম অধিকার যেমন সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা;
  - কার্যকরি সামাজিক সুরক্ষা স্কিম যেমন: বেকার ভাতা, বীমা এবং পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রোগ্রাম;
- প্যারিস চুক্তি (২০১৫) জলবায়ু কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ন্যায্য রূপান্তরে পরিবর্তনের শ্রম অধিকার রক্ষায় চ্যালেঞ্জ

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অভাব:** ন্যায্য রূপান্তরের সময় সামাজিক নিরাপত্তার অনুপস্থিতি দেখা যায়। এরকম সময়ে অনেক দেশে বেকার ভাতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুনঃপ্রশিক্ষণের অভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়।
- **সবুজ-কর্মসংস্থানে অসমতা:** সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর

শিল্প-প্রতিষ্ঠান) চাকুরির সুবিধা নাও থাকতে পারে। যেমন মজুরি কমে যাওয়া বা স্থায়ী চাকুরির অভাব ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হতেই পারে।

- **প্রান্তিক শ্রমিক**: প্রান্তিক শ্রমিক বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিক, যারা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত নন, তারা ন্যায্য রূপান্তর কাঠামোর কারণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন।
- **বৈশ্বিক বৈষম্য**: ন্যায্য রূপান্তর নীতি বাস্তবায়নের জন্য সীমিত সম্পদের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। ফলে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রম অধিকার সুরক্ষিত হয়। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের জন্য টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত স্থায়ী কাঠামো নিশ্চিত হয়।

জেন্ডার ও ন্যায্য রূপান্তর

ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবর্তনের উপর জোর দেয়। যাতে 'কাউকে পিছিয়ে ফেলে নয়'-এই নীতি নিশ্চিত হয়। এই কাঠামোর মধ্যে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে, পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর জোর দেয়া হয়, যাতে নারী এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যের কোন মানুষ যেন এ প্রক্রিয়ায় ক্ষতির শিকার না হয়। ন্যায্য রূপান্তরের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- সবুজ কর্মসংস্থানে নারী পুরুষের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার, জলবায়ু নীতির জেন্ডার প্রভাবগুলো মোকাবেলা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সি৪০ সিটিজ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ দ্বারা সম্পাদিত 'হোয়াই উইমেন উইল সেভ দ্য প্লানেট' বইয়ে

পরিবেশগত স্থায়িত্বে লিঙ্গ সমতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এবং ন্যায্য রূপান্তর অর্জনে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। ন্যায্য রূপান্তরে জেন্ডারের মূল দিকগুলো হলো:

- **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ:** নারীরা প্রায়ই শ্রমবাজারে কাঠামোগত বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। অসম বেতন এবং প্রশিক্ষণের অভাবের মতো বাঁধাগুলো অতিক্রম করার ব্যবস্থাসহ সবুজ কর্মসংস্থানগুলো নারীদের জন্য প্রবেশযোগ্য হওয়া উচিত।
- **প্রতিনিধিত্ব:** জলবায়ু সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নারী এবং বিভিন্ন লিঙ্গের ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করা জরুরি।
- **ইন্টারসেকশনালিটি:** বর্ণ, শ্রেণি, জাতিসত্ত্বা এবং অন্যান্য কারণগুলো কিভাবে জেন্ডারের সাথে সম্পর্কিত এবং রূপান্তরের সময় উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত তা জেন্ডার ভূমিকার দুর্বলতাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দেয়।
- **সামাজিক ভূমিকার সাথে অভিযোজন:** কিভাবে লিঙ্গ ভূমিকা নারীদের উপর পরিবেশগত নীতি এবং অনুশীলনের প্রভাবকে প্রভাবিত করে সেই বিষয়গুলোকে ন্যায্য রূপান্তরের সময় প্রাধান্য দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক নীতিমালায় ন্যায্য রূপান্তর

ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কাঠামো, নিয়ম, প্রবিধান এবং আইন দ্বারা গঠন করা হয় যাতে করে টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তর সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়। সমতা এবং মানবাধিকারের উপর জোর দিয়ে উত্তরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত মাত্রাগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়। ন্যায্য রূপান্তরের মূল কাঠামো এবং নীতিমালাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. **প্যারিস চুক্তি (২০১৫):** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ এবং মান সম্পন্ন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ ৪.১-এ টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করে ডিকার্বনাইজেশনের কথা বলা হয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু নীতিতে ন্যায্য রূপান্তর ধারণাকে একীভূত করে এবং রাষ্ট্রসমূহকে 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান' নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

২. **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও):** আইএলও ২০১৫ সালে ন্যায্য রূপান্তরের নির্দেশিকা প্রদান করে। ন্যায্য শ্রম নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারক, নিয়োগকারী এবং শ্রমিকদের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে।

৩. **ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল (২০১৯):** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ন্যায্য রূপান্তরের মেকানিজম গ্রহণ করে। ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, সবুজ কর্মসংস্থান জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন-এর মতো বিষয় সামনে নিয়ে আসে। এখানে টেকসই শিল্প এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জলবায়ু কার্যক্রমে সামাজিক সমতাকে একীভূত করার জন্য রোডম্যাপ করা হয়েছে।

৪. **জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন** (UNFCCC): জলবায়ু পরিবর্তনের রেসপন্স পরিমাপের জন্য ২০১৮ সালে কাটোইস কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা থাকেন। তারা রেসপন্স-এর উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য কাজ করে। জলবায়ু নীতির সামাজিক প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য দেশগুলোকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। শ্রমিক এবং

কমিউনিটির উপর জলবায়ু নীতির নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার উপর ফোকাস করে।

৫. **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য** (SDGs): ন্যায্য রূপান্তরের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২টি অভিষ্ট সরাসরি কাজ করে। লক্ষ্যমাত্রা ৮-এ বলা আছে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সকলের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ১৩-এ বলা আছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অর্জনের জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক লক্ষ্যে দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

৬. **আফ্রিকান ইউনিয়নের এজেন্ডা ২০৬৩:** আফ্রিকান ইউনিয়ন ২০৬৩ সালের মধ্যে কিছু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছে। সবুজ অর্থনীতিকে উত্তরণের জন্য টেকসই উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়। শ্রম বাজারের পরিবর্তনে নারী, পুরুষ এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক নীতি প্রণয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

৭. **আমেরিকান ক্লিন এনার্জি এন্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (প্রস্তাবিত, ২০০৯):** আইনটি এখনো পাশ হয় নি। তবে মার্কিন জলবায়ু নীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রভাব বিস্তার করে।

৮. **আইএলও কনভেনশন:** কনভেনশন ১০২ (সামাজিক নিরাপত্তা, ১৯৫২) এ বলা আছে, সর্বক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। শিল্প এবং জ্বালানি পরিবর্তনের সময় বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **আদিবাসী অধিকার এবং ন্যায্য রূপান্তর:** আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র (UNDRIP, 2007) অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। টেকসই নীতি গঠনে আদিবাসীদের মতামত এবং তাদের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক নীতিমালা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

- জাতীয় প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সমন্বয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।
- উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য মোকাবেলা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।
- সামাজিক সমতার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগতদিক বিচারে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

ন্যায্য রূপান্তরের ন্যায্যতা রক্ষার উপাদান কী কী?

অর্থ, জ্বালানি, কৃষি এবং অন্যান্য প্রধান-প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে রূপান্তর বিষয়টি এখন বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রমিক, আদিবাসী এবং সমাজে অন্যান্যদের উপর ডিকার্বনাইজেশনের প্রভাব হ্রাস করতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সামাজিক অসন্তোস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ব্যাঘাত রোধ করার জন্য ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি অপরিহার্য। ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে এবং কী অর্জন করা যায়- উল্লিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ হচ্ছে।

রূপান্তর ন্যায্যতার ক্ষেত্রে চারটি উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়। উপাদানগুলো হলো:

ঝুঁকি এবং প্রভাব: ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রভাব শ্রমিক, স্থানীয় মানুষ এবং আদিবাসীদের উপর ঝুঁকি তৈরি করে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন বিষয়গুলো অবশ্যই প্রতিরোধ ও প্রশমিত করা উচিত।

সুবিধা ও সম্ভাবনা: ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানবাধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কমিউনিটির সাধারন জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রভাবিত হয়। এছাড়া রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশীজনদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত। রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা তৈরির জন্য কাজ করা প্রয়োজন। যেমন- সবুজ অর্থনীতির অংশীজন।

জনমানুষের সংঘ এবং জবাবদিহিতা: যখন কোন বড়

রূপান্তরের ঘটনা সংগঠিত তখন, এর ফলে ঝুঁকির সম্মুখিন সকল মানুষকে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা উচিত। এর ফলে মানুষ সহজেই এই প্রক্রিয়ার অংশ হয় এবং একইসাথে প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আরো সহজে করে বললে, এই প্রক্রিয়া যারা সংগঠিত করে এটা তাদেরই দায়িত্ব যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেন সকল মানুষের চাহিদা ও দাবির বিষয়গুলো আমলে নেয়।

রূপান্তর ব্যবস্থার পরিবর্তন: ন্যায্য রূপান্তর কেবল নিষ্কাশনমূলক কার্বন অর্থনীতিকে সবুজ নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন করতে পারে না যেখানে মৌলিক শক্তি সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে। একটি টেকসই এবং ন্যায্য ভবিষ্যতের জন্য অর্থনীতির আরও মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজন যাতে পুনর্জন্মমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা যায় যা অসম শক্তির গতিশীলতাকে মোকাবেলা করে।

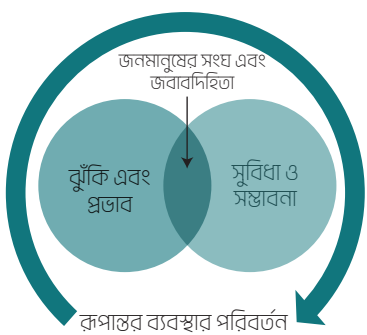

ন্যায্য রূপান্তরের উপাদান কী কী?

"ন্যায্য রূপান্তর" এমন একটি প্রক্রিয়া যা কার্বন নির্ভর অর্থনীতি

(যেমন: জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর খাত) থেকে আরও টেকসই, ন্যায়সঙ্গত এবং পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতির দিকে পরিবর্তনকে বুঝায়। এতে শ্রমিক এবং কমিউনিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে সুরক্ষা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়। ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্য হলো পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়া, যেখানে কয়লা, তেল এবং গ্যাসের মতো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এমন শ্রমিক এবং এসব খাতের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী পিছিয়ে না পড়ে। ন্যায্য রূপান্তরের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা: ILO ২০১৫ সালে Just Transition: A Fair and Inclusive Process for a Green Economy রিপোর্টে শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে ন্যায্য রূপান্তরের উপাদান তুলে ধরে। উপাদানগুলো হলো-

- উচ্চ-কার্বন শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বেকারত্ব ভাতা, পেনশন এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- নতুন সবুজ খাতে (যেমন-নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ প্রযুক্তি) কর্মসংস্থানের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে। ফলে সবুজ খাত টেকসই খাত হিসেবে আবির্ভূত হবে।
- সরকারি কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতিতে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২. প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বৈচিত্রকরণ: The Global

Commission on the Economy and Climate ২০১৪ সালে Better Growth, Better Climate রিপোর্টে ন্যায্য রূপান্তরের উপাদান হিসেবে অর্থনৈতিক বৈচিত্রকরণের বিষয়ে আলোকপাত করে। তা হলো:

- ন্যায্য রূপান্তর কার্বন নির্ভর শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক বৈচিত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। নতুন অথবা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হলে অঞ্চলভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারি নীতিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমে। ফলে স্থানীয় মানুষজন টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের সুযোগগুলো থেকে সরাসরি উপকৃত হয়।
- স্থানীয় মানুষের হাতে সবুজ প্রযুক্তির মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩. **অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততা:** ILO ২০১৫ সালে Social Dialogue for Just Transition রিপোর্টে ন্যায্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততার বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে।

- ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের জন্য সবার অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ন্যায্য রূপান্তরের উল্লেখযোগ্য অংশীজন-শ্রমিক, নিয়োগকর্তা, সরকার, পরিবেশবাদী গোষ্ঠী এবং প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে।
- ন্যায্য রূপান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মতামতকে প্রাধান্য

দিতে হবে। বিশেষ করে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের মানুষ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতামতকে প্রাধান্য প্রদান।

- অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় সংলাপ ও অংশীদারিত্ব তৈরির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে করে কেউ উপেক্ষিত না হয় এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রয়োজন সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়।

৪. **পরিবেশগত স্থায়িত্ব:** United Nations Environment Programme (UNEP) ২০১১ সালে Green Economy: A Brief for Policymakers রিপোর্টে ন্যায্য রূপান্তরের সময় পরিবেশগত স্থায়িত্বের উপর জোর দেয়। পরিবেশ অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে হলে পরিবেশগত স্থায়িত্বকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই চর্চা প্রচলন করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, জ্বালানি দক্ষতা উন্নত করা এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর উপর জোর দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য পরিবেশগত টেকসই করতে কাজ করা প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব জ্বালানি যেমন- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জলবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রথাগত জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমাবে এবং দূষণও হ্রাস করবে। জ্বালানি অপচয় কমানোর জন্য ভবনগুলোতে শক্তি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্যক্ষমতা বাড়ানো এবং গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করা দরকার।

- সর্বক্ষেত্রে টেকসই উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইন তৈরি করতে হবে। পুনঃব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপচয় কমিয়ে সার্কুলার অর্থনীতির মডেল বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

- কার্বন নিঃসরণ কমাতে গাড়িতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার,

পরিবহন খাতে বিকল্প জ্বালানির প্রচলন এবং গাছ লাগানোর মতো কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন। কার্বন শোষণ করার প্রযুক্তিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

- প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বৃক্ষরোপণ, জলাভূমি সংরক্ষণ এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে মাটি ক্ষয় রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত থাকবে। কৃষি ক্ষেত্রে মাটি সুরক্ষায় ফসল চাষ, অর্গানিক কৃষি এবং বনজ চাষের মতো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একই সাথে খাদ্য অপচয় কমানো এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করতে হবে।

সব মিলিয়ে পরিবেশ রক্ষায় টেকসই উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব।

৫. রূপান্তর সুবিধার ন্যায্য বণ্টন

- প্রান্তিক এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের প্রায়শই পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় যাতে করে তারা পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সবুজ পরিবর্তনের সুবিধাগুলো সমানভাবে বিতরণ করা উচিত।
- নীতিগত ব্যবস্থা যেমন- প্রগতিশীল কর/ প্রগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন[১] এবং সবুজ চাকুরিতে ন্যায় সঙ্গত প্রবেশাধিকার রূপান্তরের ব্যয় এবং সুবিধাগুলো ন্যায্যভাবে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- লিঙ্গ সমতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত কারণ বিশ্বের অনেক জায়গায় নারীরা পরিবেশ অবনয়ন এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের দ্বারা অসমভাবে ক্ষতির শিকার হয়।

[১]ইউরোপিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (ইটিইউসি), জাস্ট ট্রানজিশন: এ শেয়ার্ড ভিশন ফর অল (২০২০)

৬. নীতি কাঠামো এবং আইনি কাঠামো:

- সরকার একটি নীতিগত পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ন্যায্য রূপান্তরকে সমর্থন করে। এর মধ্যে রয়েছে- পরিচ্ছন্ন জলবায়ু নীতি প্রতিষ্ঠা, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী এবং শিল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সবুজ বিনিয়োগের প্রচার।
- ন্যায্যতা, সমতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য রূপান্তর প্রক্রিয়াকে গাইড করার জন্য আইন[২] এবং প্রবিধানগুলো প্রয়োজনীয়।

৭. বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা

- ন্যায্য রূপান্তর হচ্ছে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ, জ্ঞান, সম্পদ এবং প্রযুক্তি ভাগ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর, যাদের সম্পদ কম তাদের ন্যায্য রূপান্তর অর্জনের জন্য ধনী দেশগুলোর সমর্থন প্রয়োজন[৩]।
- সমস্ত দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু অর্থ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যায্য পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন, যা সবুজ অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কর্মীদের সুরক্ষা, সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং ন্যায্য বণ্টনের উপর দৃষ্টি আরোপ করে।

---

[২]দ্যা প্যারিস এগ্রিমেন্ট (২০১৫), আর্টিকেল ২: জলবায়ু লক্ষ্য এবং ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

[৩]ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি), দ্যা প্যারিস এগ্রিমেন্ট (২০১৫)

ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করতে পারে এমন টেকসই অর্থনীতির সুবিধা ন্যায় সঙ্গত বণ্টন এবং পাশাপাশি নাজুক জনগোষ্ঠীগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে।

ন্যায্য রূপান্তরের খাতসমূহ

ড্যারেন ম্যাককলি সম্পাদিত "দ্যা ফিউচার অফ জাস্ট ট্রানজিশন: থিওরি এন্ড ইমপ্লিমেনটেশন" বইয়ে ন্যায্য রূপান্তরের খাতসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। আঞ্চলিক অগ্রাধিকার এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে ন্যায্য রূপান্তরের সাথে জড়িত সেক্টর বা খাতগুলো ব্যাপক পরিবর্তিত হয়। এই সেক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে-

জ্বালানি: ন্যায্য রূপান্তরের অন্যতম খাত হচ্ছে জ্বালানি খাত। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের সময় কয়লা, জ্বালানি তেল এবং গ্যাস খাতে কাজ করে এমন শ্রমিকদেরকে পুনরায় দক্ষ ও পুনরায় চাকুরি নিশ্চিত করা হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে উক্ত খাতটি স্থিতিশীল এবং টেকসই খাত হিসেবে আবির্ভুত হবে।

উৎপাদন এবং শিল্প: উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নির্ভর করে। সবুজ প্রযুক্তি এবং শক্তি ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা যায় এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সবুজ প্রযুক্তি এবং শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচার করা হয়।

কৃষি: বিশ্বব্যাপী সাধারণত কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জমিতে সেচ দেয়ার জন্য কায়িক এবং জ্বালানি নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফলে কৃষিতে উৎপাদন কম হয় এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জলবায়ু-স্মার্ট অনুশীলনগুলো বাস্তবায়ন করার এবং গ্রামীণ

জীবিকার মান বৃদ্ধিকে সমর্থন করে।

পরিবহন: অধিকাংশ যানবাহন খনিজ জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। খনিজ জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে বায়ু দূষণ হয়। ফলে প্রাণিকূল নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় এবং পরিবেশে ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পায়। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পরিবহন খাতে বৈদ্যুতিক গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং টেকসই পাবলিক ট্রানজিটে যাওয়ার জন্য কাজ করে।

নির্মাণ এবং নগর উন্নয়ন: অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পরিবেশকে প্রাধান্য না দিয়ে অদক্ষ কর্মী দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয় এবং নকশা ও উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবেশকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। ফলে টেকসই নগর উন্নয়ন সম্ভব হয় না। ন্যায্য রূপান্তর টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োজন, ভবনের টেকসই নকশা তৈরি এবং গুনগত উপকরণ ব্যবহার নির্দেশ করে।

ন্যায্য রূপান্তরের মানদন্ড

ন্যায্য রূপান্তরের জন্য নতুন মানদন্ড এবং কাঠামো রয়েছে যা স্বল্প-কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তরের সময় ন্যায্য এবং ন্যায় সঙ্গত কৌশল বাস্তবায়নে সরকার, সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গাইড করে। যদিও ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের জন্য বৈশ্বিক একক কোন মানদন্ড নেই তবে ধারণাটিকে মানসম্মত এবং কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা বেশ কয়েকটি মূলনীতি, নির্দেশিকা এবং কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ন্যায্য রূপান্তরের জন্য মূল মানদন্ড এবং কাঠামোগুলো হলো-

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১৫ সালে ন্যায্য রূপান্তরের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। আইএলও এর নির্দেশিকা হলো ন্যায্য পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে স্বীকৃত মানদন্ডগুলোর মধ্যে একটি। পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনীতি এবং সকলের জন্য যৌক্তিক

পরিবর্তনের বিষয়টি আইএলও প্রণীত নির্দেশিকায় বলা আছে। এছাড়া টেকসই রূপান্তরের সময় সমতা, সামাজিক সংলাপ এবং ডিসেন্ট ওয়ার্ক নিশ্চিত করার রূপরেখা প্রদান করে। আইএলও প্রণীত মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- লক্ষ্য এবং উল্টরণের পথে সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা।
- সরকার, নিয়োগদাতা, শ্রমিক এবং কমিউনিটির সদস্যদের সাথে সংলাপ করা।

২. যদিও প্যারিস চুক্তি (২০১৫) একটি বিশদ মানদন্ড নয় তারপরও এটি ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনে ভূমিকা রাখে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শালীন কাজ এবং মানসম্পন্ন কাজের উপর জোর দেয়।

৩. জাতিসংঘের জলবায়ু কার্যক্রম এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে একীভূত করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্টগুলোর সাথে ন্যায্য রূপান্তরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন- অভীষ্ট ৮ (শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) এবং অভীষ্ট ১৩ (জলবায়ু কার্যক্রম)।

৪. ইউরোপীয় ইউনিয়নের ন্যায্য রূপান্তরের মেকানিজম রয়েছে যা সবুজ রূপান্তরের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ন্যায্য রূপান্তরের মেকানিজমের মূল বিষয়গুলো হলো-

- ন্যায্য রূপান্তর ফান্ড বা অর্থায়ন।
- আঞ্চলিক পর্যায়ে উত্তরণ পরিকল্পনা।

- পুনরায় দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানী বৈচিত্র্যকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন।

৫. দায়িত্বশীল বিনিয়োগের মূলনীতি (পিআরআই) এবং অন্যান্য আর্থিক উদ্যোগগুলো জোর দেয় যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ন্যায্য ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত, সামাজিক এবং সুশাসনের মানদন্ডে ন্যায্য রূপান্তর একীভুত করা উচিত।

৬. ২০২১ সালে COP ২৬ সম্মেলনে ন্যায্য রূপান্তর ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় দেশগুলোকে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, শোভন কাজ এবং জলবায়ু নীতির সিদ্ধান্তগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ন্যায্য রূপান্তর মানদন্ডের মূলনীতি

নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত নীতিগুলো সার্বজনীন হিসেবে বিবেচিত হয়। নীতিগুলো হলো-

- ন্যায্য রূপান্তর শোভন কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়। ন্যায্য মজুরি এবং শর্তসহ সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিশ্চয়তা দেয়া মূলনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম।
- ন্যায্য রূপান্তর সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার কথা বলে। বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা জাল তৈরি করার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যেমন- বেকারত্বের সুবিধা, পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং পেনশন।
- প্রান্তীক জনগোষ্ঠীসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় যাতে করে সকলে মূল ধারায় আসতে পারে।
- পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য নীতিগুলোকে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্যগুলোকে একীভূত করা হয়।
- ন্যায্য রূপান্তরের অন্যতম মূলনীতি হলো সাংস্কৃতিক

সংবেদনশীলতা। পরিবর্তনের সময় স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় নিয়ে নীতিমাল প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়।

ন্যায্য রূপান্তর মানদন্ডের চ্যালেঞ্জ

ন্যায্য রূপান্তরের জন্য ফ্রেমওয়ার্কগুলো নির্দেশনা প্রদান করলেও সার্বজনীন রূপান্তরের মানদন্ডের আলোকে বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং। কারণগুলো হলো-

- বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা রয়েছে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক জলবায়ু নীতির প্রভাব।
- সামাজিক ন্যায্যতার সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভারসাম্য বজায় রাখা।

বাংলাদেশে ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুর্বল অবকাঠামো এবং সেক্টরের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার চ্যালেঞ্জ থেকে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা থেকে ন্যায্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাই আর্থ-সামাজিক বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলা এড়াতে কম কার্বন এবং জলবায়ু-সহনশীল অর্থনীতির দিকে রূপান্তর অবশ্যই ন্যায় সঙ্গত হতে হবে। বাংলাদেশে ন্যায্য রূপান্তরের মূল কারণসমূহ হচ্ছে-

১. **জলবায়ুর নাজুকতা এবং অভিবাসন**: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। উল্লিখিত কারণগুলো অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে। প্রায়শই গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। পোশাক খাত অনেক

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করেছে যা ন্যায্য রূপান্তর কাঠামোর সম্ভাব্য ভূমিকা তুলে ধরে। সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

২. **দেশের মূল খাতে কর্মসংস্থান:** তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। এই খাতে সবুজ অনুশীলনগুলোকে একীভূত করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে, তবুও শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। রূপান্তরের জন্য যেসব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সেই নীতিগুলো বুঝতে পারার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সবুজ পরিবর্তনের সময় ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৩. **নীতিমালা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা:** বাংলাদেশ ন্যায্য রূপান্তর উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং অর্থায়ন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তোরণের জন্য জলবায়ু তহবিলের সুবিধা আরও কমে যেতে পারে যা অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

৪. **জ্বালানি রূপান্তর:** জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাওয়া জলবায়ু লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। ন্যায্য রূপান্তর এমনভাবে করা উচিত যাতে করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাঘাত এড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং জ্বালানির ন্যায় সঙ্গত সুবিধা বিবেচনা করা যায়।

৫. **সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্য একীভুতকরণ:** বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল, কর্মপরিকল্পনার নীতি এবং জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি ন্যায্য রূপান্তরের নীতির সাথে সাজানো। তবে ন্যায্য রূপান্তর বাস্তবায়নের জন্য স্টেকহোল্ডারের মধ্যে জোরালো সহযোগিতা প্রয়োজন। স্টেকহোল্ডারগুলোর মধ্যে

রয়েছে- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং শ্রমিক সংগঠন। ন্যায্য উত্তোরণের ধারণা বাংলাদেশের জন্য আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতাকে এগিয়ে নিয়ে জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে।

জ্বালানি রূপান্তর কী?

জ্বালানি রূপান্তর বলতে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থা থেকে নবায়নযোগ্য এবং স্বল্প-কার্বন জ্বালানি উৎস দ্বারা প্রভাবিত পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। এই পরিবর্তনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্বালানি সুরক্ষা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা চালিত হয়। জ্বালানি পরিবর্তন প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। জ্বালানি রূপান্তর স্থানীয় সম্পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নীতি কাঠামোর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবর্তিত হয়। জ্বালানি রূপান্তরের মূল উপাদানগুলো হলো-

জ্বালানি রূপান্তরের উপাদান

১. ডি-কার্বনাইজেশন

জ্বালানি রূপান্তরের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো কয়লা, জ্বালানি তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য উৎসগুলোতে রূপান্তর করে কার্বন নির্গমন হ্রাস করা।

২. বিদ্যুতায়ন

পরিবহন এবং তাপায়ন করার মতো খাত যা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ খাতে রূপান্তর নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩. এ্যানার্জি ইফিসিয়েন্সি
শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভবন এবং উৎপাদনের উপায় সম্পর্কিত যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিক এবং উন্নত হওয়ায় সামগ্রিক জ্বালানি চাহিদা হ্রাস করে রূপান্তর সহজ করে।

৪. বিকেন্দ্রীকরণ
নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর যেমন- সৌর প্যানেল এবং ছোট আকারে বায়ু বিদ্যুৎ ফার্ম জ্বালানি ব্যবস্থার সাথে জড়িত যা কেন্দ্রীভূত জীবাশ্ম জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে।

৫. উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি
শক্তি সঞ্চয় স্থানে অগ্রগতি (যেমন-ব্যাটারির মান বৃদ্ধি), গ্রিড অবকাঠামো এবং স্মার্ট প্রযুক্তিগুলো নবায়নযোগ্য শক্তির পরিবর্তনশীলতা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাত্রা
ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্বালানির রূপান্তর সবুজ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে ন্যায় সঙ্গত প্রবেশাধিকার এবং ঐতিহ্যগত জ্বালানি সেক্টরে শ্রমিকদের জন্য পুনরায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিবেচনা করে।

জ্বালানি রূপান্তরের চালিকাশক্তি

১. জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন
প্যারিস চুক্তি এবং নেট-জিরো নির্গমন জাতীয় প্রতিশ্রুতিগুলো জ্বালানি রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি।

২. প্রযুক্তিগত অগ্রগতি
নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং জ্বালানি সঞ্চয় ব্যবস্থার

ক্রমহ্রাসমান খরচ রূপান্তরকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলে।

৩. জ্বালানি নিরাপত্তা
আমদানীকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে জাতীয় নিরাপত্তা বাড়ায়।

৪. জনসচেতনতা এবং নীতি
পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়ক সরকারি নীতিগুলো উত্তরণকে ত্বরান্বিত করে।

শক্তি রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিরতি

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের সময় বিরতি নিতে হয়। সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন আবহাওয়া নির্ভর। আবহাওয়া ভালো থাকলে অথবা শক্তি উৎপাদনে অনুকূল পরিবেশ থাকলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শক্তি সঞ্চয়ের জায়গা এবং গ্রিড অবকাঠামোতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় যা রূপান্তরের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

২. অর্থনৈতিক প্রভাব
ন্যায্য রূপান্তরের কৌশলের প্রয়োজন হয় যাতে করে জ্বালানি নির্ভর অঞ্চলগুলো পরিবর্তনের সময় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হয়।

৩. অবকাঠামো
জ্বালানি গ্রিড এর উৎকর্ষ সাধন এবং আধুনিকীকরণ একটি জটিল এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া যা ন্যায্য রূপান্তরের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৪. সমতা এবং প্রবেশাধিকার

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন শক্তির সুবিধা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্য রূপান্তরের সময় তাদের সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

জ্বালানি রূপান্তর শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, এটি একটি সামাজিক পরিবর্তনও বটে। এই পরিবর্তনের সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বাস্তবায়নযোগ্য নীতি কাঠামো, উদ্ভাবন এবং সমতার প্রতিশ্রুতির উপর।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি রূপান্তর

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তর বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের মুখোমুখি। বাংলাদেশের বর্তমান এনার্জি ল্যান্ডস্কেপ-

১. শক্তির উৎস

- **প্রাকৃতিক গ্যাস:** বাংলাদেশে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহার করা হয়। মোট জ্বালানি চাহিদার ৫০% প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- **কয়লা:** পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ব্যবহার করা হয়।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি:** বাংলাদেশে সৌর শক্তির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সৌর শক্তি উৎপাদনের জন্য খামার তৈরি হয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় সৌর খামারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার বাড়িগুলোতে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে।

- **বায়োমাস:** রান্না এবং কোন কিছুতে তাপ দেয়ার জন্য গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপকভাবে বায়োমাস অর্থাৎ কৃষি উপজাত দ্রব্য, বন বা জঙ্গলের গাছের পাতা ও শুকনো অংশ, গোবর এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ময়লা বা আবর্জনা ব্যবহার করা হয়।

২. জ্বালানি খাতে প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশ জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য হারে অগ্রগতি অর্জন করেছে। মোট জনসংখ্যার ৯৬% এর বেশি বিদ্যুতের সুবিধা পেয়েছে। তবে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

৩. জ্বালানির চাহিদা

দ্রুত নগরায়ণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জ্বালানি চাহিদা বাড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্বালানির চাহিদা দ্বিগুন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য এবং নীতি

বাংলাদেশ সরকার সময়ের সাথে সাথে জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নীতি প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন এবং সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য ও নীতিগুলো হলো-

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন:** বাংলাদেশ সরকারের "ভিশন

২০৪১" পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি শক্তির ৪০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তিতে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো কাজ করছে। নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে রয়েছে- সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি এবং জলবিদ্যুৎ। এছাড়া অফ-গ্রিডের নবায়নযোগ্য সমাধানের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- **জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস:** জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করার বিষয়ে বলা হয়। যেমন-নবায়নযোগ্য এবং আঞ্চলিক জ্বালানি শক্তির বাণিজ্যের মাধ্যমে জ্বালানি উৎসের বৈচিত্রকরণ।

- **জ্বালানি সক্ষমতা:** শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ভবনগুলোতে পরিবেশের ভারসাম্যের দিক বিবেচনায় নিয়ে আধুনিক জ্বালানির উপায় এবং প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা। জ্বালানির চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে টেকসই এবং স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **জাতীয় সৌর শক্তি কর্মসূচি:** বাংলাদেশ জাতীয় সৌর শক্তি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সৌর সেচ পাম্প এবং ছাদে সৌর প্যানেল বা সোলার সিস্টেম স্থাপনের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যে সব প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই সেই এলাকাগুলোতে সোলার সিস্টেম স্থাপনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে ভারসাম্য নিয়ে আসার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতায় আঞ্চলিক গ্রিড আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে প্রতিবেশি দেশ ভারত ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছে।

বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ

- **অর্থায়ন:** নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বাজেট নির্ধারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অনেকাংশে আন্তর্জাতিক তহবিল এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।
- **নীতিমালা:** নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রহণের জন্য শক্তিশালী নীতিমালা এবং প্রণোদনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিদ্যমান নীতিমালার কারণে সৌর শক্তি এবং বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।
- **প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো:** বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির জন্য সীমিত উৎপাদন দক্ষতা এবং ক্ষমতা কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পুরাতন অবকাঠামো ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই বাংলাদেশে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং নতুন অবকাঠামো তৈরি করা অনেক কঠিন।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়:** বাংলাদেশে বায়োমাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানি হতে রূপান্তরের জন্য আচরণগত এবং শিক্ষার প্রয়োজন। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শিল্পে কর্মীদের জন্য ন্যায্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তরের সম্ভাবনা

- **নবায়নযোগ্য সম্পদের প্রাচুর্যতা:** বাংলাদেশে উচ্চ সৌর বিকিরণ সৌর বিদ্যুতের উন্নয়নের জন্য আদর্শ জায়গা। উচ্চ সৌর বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। উপকূলীয় অঞ্চলে বায়ু শক্তি ব্যবহার করে

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **জ্বালানি উৎপাদনে বিকেন্দ্রীকরণ:** বাংলাদেশে অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম এবং ক্ষুদ্র গ্রিডগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নবায়নযোগ্য শক্তি সরবরাহ করতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চল নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল:** সবুজ জলবায়ু তহবিল এবং দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থায়ন নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন প্রকল্পগুলো সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ন্যায্য রূপান্তরে সুশীল সমাজের ভূমিকা

ন্যায্য রূপান্তর যাতে ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সুশীল সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের কার্যক্রম প্রায়শই নীতি কাঠামো, কমিউনিটি এবং সামাজিক চাহিদাগুলোর মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে-শ্রমিক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, এ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন। Dimitris Stevis এবং Tamara L. Sheldon সম্পাদিত বই 'Just Transitions: Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World (2020)' এ ন্যায্য পরিবর্তনে সুশীল সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো-

- **এ্যাডভোকেসি এবং সচেতনতা বাড়ানো:** সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো কমিউনিটির উপর জলবায়ু কার্যক্রমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ন্যায়সঙ্গত নীতির আলোকে তুলে ধরে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন নারী, আদিবাসী এবং যারা অনানুষ্ঠানিক কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে ন্যায্য রূপান্তরের ধারণা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

- **নীতিমালা উন্নয়ন এবং লবিং কার্যক্রম:** সমতা, শ্রম অধিকার এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেয় এমন নীতিমাল প্রণয়ন করতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলোকে মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য এ্যাডভোকেসি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

- **মনিটরিং এবং একাউন্টিবিলিটি:** সরকার এবং কর্পোরেশনগুলো যাতে করে কার্যকরভাবে ন্যায্য রূপান্তর নীতিগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য ওয়াচডগের ভূমিকা পালন নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমের মান, পরিবেশগত প্রভাব এবং ন্যায্য রূপান্তরের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল নিরীক্ষণ করতে হবে।

- **কমিউনিটি মোবিলাইজেশন এবং ক্ষমতায়ন:** সুশীল সমাজ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিগুলোতে মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাতে করে ন্যায্য রূপান্তরের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীগুলোকে নীতিমালা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা যায়। এছাড়া তারা সবুজ অর্থনীতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য শ্রমিক এবং কমিউনিটিগুলোকে ক্ষমতায়ন করার জন্য এবং সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে।

- **স্থানীয় এবং বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেতুবন্ধন:** সুশীল সমাজ জাতীয় এবং বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। তারা কোপ সম্মেলন এবং জাতিসংঘের

মতো আন্তর্জাতিক ফোরামে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে মতামত প্রদান করে।

- **গবেষণা এবং জ্ঞান শেয়ার করা:** গবেষণা তথ্যের জন্য মূখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ভূমিকা রয়েছে। পূর্ববর্তী পরিবর্তন থেকে শেখা সেরা অনুশীলন এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অনুশীলন করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজন আছে। টেকসই সমাধান করার জন্য সরকার এবং কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী গ্রুপ হিসেবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি কাজ করে।

ন্যায্য পরিবর্তনে নাগরিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

- ন্যায্য রূপান্তরের জন্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে এ্যাডভোকেসি করতে সীমিত সম্পদ এবং তহবিল বরাদ্দ থাকে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
- অনেক সময় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে না ফলে ন্যায্য রূপান্তরের সুবিধা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী পায় না।
- পলিসি এ্যাডভোকেসি করার সময় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করার সক্ষমতা থাকে না। ফলে তারা এ্যাডভোকেসি করার সময় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

এই প্রকাশনা সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন

অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
বাড়ি নং ২৩, সড়ক ২৮, ব্লক- কে
বনানী, ঢাকা-১২১৩।

https://www.linkedin.com/company/oxfaminbd/

ফেয়ার ফাইন্যান্স এশিয়া
https://fairfinanceasia.org

প্রার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান

contact@praan.org.bd
praanbd.org@gmail.com

www.praan.org.bd